Bangla Kounterkulture Archive | curation Q | Surojit | Sucheta volunteers Suman | Avishek

১বৈশাখ ১৪২২ ● ১৫ এপ্রিল ২০১৫

১• আজি হতে দ্বিসহস্রবর্ষ পরে

কিউ ও সুরজিত

কে তুমি পড়িছ আমাদের লিঙ্কখানি?

আ মিডসামার নাইটস ড্রিম

মদ, গাঁজা, চরস, কোকেন, ট্যাবলেট ছাড়াই আমরা (কিউ/সুরজিত) একটা স্বপ্ন দেখলাম, ঘুমিয়ে নয়, জেগেই। সেই স্বপ্নটা এইরকম:

রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন ১০০ বছর পর যে তাঁর কবিতা পড়ছে, তার উদ্দেশ্যে একটি কবিতা লিখে রাখা উচিত। আমরা ভাবছি ২০০০ বছর। হ্যাঁ, আজ থেকে ২০০০ বছর পরে ৪০১৫ সালে যাঁরা বাংলা কাউন্টারকালচার সম্পর্কে জানতে চাইবেন তাঁদের উদ্দেশ্যে কিছু লিখে রাখা ডিজিটাল ফর্মে। সেই ৪০১৫ সালে ইন্টারনেট সার্চ ইঞ্জিনটি প্রতিটি মানবদেহেই ইনস্টলড বাই ডিফল্ট। তার জন্য ওয়াই ফাই বা আই ফোন কি স্মার্ট ফোন কিছুরই প্রয়োজন পড়ে না।

এমনই এক বসন্তদিনে জনা ছয়েক নারী-পুরুষের একটি দল, যারা বাঙালি, ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে হাজির হয় নবগ্রহমণ্ডল থেকে বিতাড়িত প্রাক্তন নবম গ্রহ প্লুটোয়। তখন মহাকাশে আন্তর্গ্রহ ঘোরাফেরা হাওড়া/শিয়ালদা ডেলি প্যাসেঞ্জারি করার মতো সহজ ব্যাপার হলেও প্লুটোয় চট করে কেউ যায় না।

কেন? কারণ অভিজাত গ্রহমণ্ডলীর মোড়ল পৃথিবীর (সূর্যের একান্ত আপন) জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা প্লুটোকে আর গ্রহ বলে মনে করেন না। ১৯৩০ সালে যে প্লুটোকে আবিষ্কার করা হল ২০০৬ সালে ৭৬ বছর পর তার গ্রহের মর্যাদা কেড়ে নেওয়া হল। কেন? কারণ প্লুটো বামন, ছোটো আর সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে সময় নেয় ২৪৮ বছর! সূর্যের কাছে বা কেন্দ্রের কাছে এটা তো বেশ অবজ্ঞার ব্যাপার (কারণ তার ২৪৮ বছরে ১ বার প্রদক্ষিণ করলেই চলে, যেখানে সূর্যের অনুগত মোড়ল পৃথিবীর ৩৬৫ দিনে ১ বার প্রদক্ষিণ না করলে চলে না) আর অক্ষমতার ব্যাপার (যার ২৪৮ বছর প্রদক্ষিণ করতে লাগে সে গ্রহ হবার যোগ্য নয়)। প্লুটোর কাছে যা নিজ বৈশিষ্ট্য। ৭৬ বছর ধরে এই অবজ্ঞা আর অক্ষমতা সহ্য করার পর মোড়ল ঠিক করে যথেষ্ট হয়েছে। ওটাকে ঘাড় ধরে বের করে দাও সমাজ থেকে।

সেই থেকে প্লুটো পরিত্যক্ত, প্রান্তিক, প্লুটো হল অভিজাত অষ্টগ্রহমণ্ডলের উলটোদিকে দাঁড়ানো একা কাউন্টারকালচার। প্লুটোর মতো দুটো হয় না। ৪০১৫তে সেই প্লুটোতে গিয়ে বাঙালি দলটি ইন্টারনেট সার্চ ইঞ্জিনের মারফত জানতে পারে একমাত্র প্লুটোয় এলেই ODDJOINT#Banglablack এর লিঙ্কটি পাওয়া যায়। তাঁরা সবাই যে যার সার্চ ইঞ্জিনে লিঙ্কটি খুলে একে একে সব লেখা পড়তে শুরু করেন। পড়তে গিয়ে দেখেন বাংলা কাউন্টারকালচারের ঐতিহাসিক ডকুমেন্টগুলি পাতার পর পাতা লেখা আছে। কখন চলে গেছে তাঁদের নিজ গ্রহে ফিরে যাবার শেষ ট্রেন। তাঁরা ঠিক করেন মাসে অন্তত ১ বার তাঁরা প্লুটোয় আসবেনই এবং সমবেত ODDJOINT#Banglablack লিঙ্ক পাঠ করবেন। এইরকম একটি দিনের দিকে তাকিয়েই আমাদের এই বাংলা কাউন্টারকালচারের ইন্টারনেট আর্কাইভিং-এর শুরু।

বইয়ের পুনর্জন্ম

আমাদের জীবনে বইপত্র বা এককথায় তথ্যভাণ্ডার বলতে বোঝায় লাইব্রেরি বা সরকারি মহাফেজখানা। যেখান থেকে বই নিয়ে আমরা পড়াতে পারতাম। লাইব্রেরিতে বসে বা বাড়িতে এনে। আর হ্যাঁ, দোকান থেকে বই কিনেও পড়তে পারতাম। এই সুযোগ নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক মানুষের জন্যে ছিল। এই বইকেই এখন ইন্টারনেটের ভাষায় আমরা হার্ড কপি বলি। এই লাইব্রেরি বা মহাফেজখানা যদি কোনো কারণে ধ্বংস হয়ে যায়, যেমন ইজিপ্টের আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত গ্রন্থাগারটি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল যুদ্ধের কারণে। তাহলে সেই জ্ঞানভাণ্ডারকে উদ্ধার করার উপায় কী? এটি প্রথম প্রশ্ন। দ্বিতীয় প্রশ্ন, এই লাইব্রেরি বা মহাফেজখানায় গিয়ে পড়বার সুযোগ নির্দিষ্ট কিছু মানুষের আছে, কিন্তু আরও বেশি সংখ্যক মানুষ কী করে এই জ্ঞানভাণ্ডারের সুযোগ নেবে? তৃতীয় প্রশ্ন, এই জ্ঞানভাণ্ডারকে মানচিত্রের গণ্ডি থেকে মুক্তি দেওয়া যাবে কী করে? যাতে একই সঙ্গে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ এটা ব্যবহার করতে পারে। চতুর্থ প্রশ্ন, লাইব্রেরি বা মহাফেজখানা নির্দিষ্ট সময় খোলে এবং বন্ধ হয়। এই সময়বন্দি জীবন থেকে জ্ঞানভাণ্ডারকে মুক্তি দেওয়া যাবে কী করে? যাতে ২৪ ঘণ্টা সারা পৃথিবীর মানুষ ব্যবহার করতে পারে। পঞ্চম প্রশ্ন, এই জ্ঞানভাণ্ডারকে মালিকানা মুক্ত করা যাবে কী করে? লাইব্রেরি বা মহাফেজখানার মালিক রাষ্ট্র বা কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। সেই মালিকের মর্জির ওপর নির্ভর করে সেটা কে ব্যবহার করবে আর কে করবে না।

এই সব প্রশ্নের একটাই উত্তর হার্ড কপি সমস্ত বই ও পুঁথির সফটকপি একটি নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে ডিজিটাল আর্কাইভিং করে ইন্টারনেটে রেখে দেওয়া। এই হল বইয়ের পুনর্জন্মের কথা।

ইন্টারনেট আর্কাইভ

১৯৯৬ সালে আমেরিকার সানফ্রান্সিস্কো শহরে কিছু মানুষের মনে একটু আগে বলা প্রশ্নগুলোর উদয় হয়েছিল। তাঁরা শুরু করেছিলেন ডিজিটাল ইন্টারনেট আর্কাইভিং। শুধু বই নয়, ফিল্ম, পেন্টিং, মিউজিক সবকিছুরই আর্কাইভিং তাঁরা করে আসছেন গত ১৯ বছর ধরে। ইন্টারনেট আর্কাইভ হল একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। যার কর্মী সংখ্যা ২০০ আর সারা পৃথিবী জুড়ে রয়েছে অনেক অনেক স্বেচ্ছাসেবী আর এটি চলে মানুষের দেওয়া ডোনেশনে।
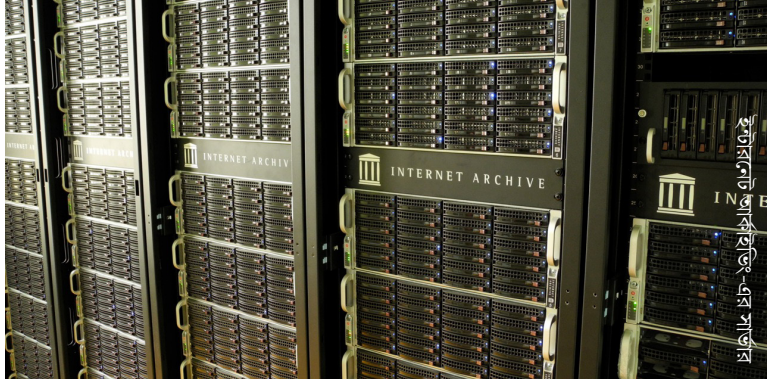
এই আর্কাইভটি তৈরির জন্য লাগছে না ফাইল, বুকর্যাক, ক্যাটালগ, লাইব্রেরিয়ান ও তাঁর সহকারিবৃন্দদের। ও হ্যাঁ, লাগে একটি অফিস আর একটি ডোমেইন এবং একটি ওয়েবসাইটই যথেষ্ট এটি তৈরি করতে। এই ওয়েবসাইটে বিভিন্ন লাইসেন্সে সারা পৃথিবীর সৃষ্টিশীল কাজগুলি রাখা আছে। প্রতিনিয়তি রাখা হচ্ছে। এই ইন্টারনেট আর্কাইভিং-এর কোনো মালিকানা নেই। এটা ফ্রি। পৃথিবীর যে কোনো মানুষ এটা ফ্রিতে ব্যবহার করতে পারে। ভালো উদ্দেশ্যে করতে পারে খারাপ উদ্দেশ্যেও করতে পারে। ফ্রি এই অর্থে বিষয়টি যে লাইসেন্সের অধীনে আছে সেই লাইসেন্সের শর্তে ব্যবহার করা যাবে। যেন আমার মানিব্যাগটা টেবিলে রাখা আছে, তুমি তোমার প্রয়োজন মতো টাকা নাও, অর্থাৎ বিষয়টা হল আমার যা জিনিস সেটা আমারও এবং সেটা আর বাকি মানুষদেরও। কীভাবে দেব সেটা বলা আছে। যাঁরা এই কাজটি করছেন তাঁরা পরিকল্পনা করেছেন যাতে ৫০০০ বছর পরেও মানুষ এই আর্কাইভ ব্যবহার করতে পারে। এই নিঃশব্দ বিপ্লবটি করে চলেছেন তাঁরা ওই ৫০০০ বছর পরের পাঠকটির কথা ভেবেই।

বাংলায় কাউন্টারকালচার বা বাংলাব্ল্যাক

প্রথমেই বলে রাখি 'কাউন্টারকালচার' শব্দটির জন্ম ১৯৬০-এর দশকের আমেরিকায়। এর অর্থ, এটি এমন একটি জীবনযাপন বা ভঙ্গী বা লেখা বা যে কোনো সৃষ্টি যা সমাজের প্রতিষ্ঠিত নৈতিকতা, ক্ষমতানক্সা, জীবনযাপন ও শিল্পশর্তের উলটোদিকে দাঁড়িয়ে আছে। আমেরিকায় জন্ম হলেও এই শব্দটি এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক আন্দোলন হয়ে সারা ইউরোপে তথা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

বাংলা সাহিত্যের নগণ্য পাঠক হিসেবে আমাদের মনে হয়েছে, আমাদের বাংলা ভাষার ইতিহাসেও এক ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি হয়ে এসেছে চিরকালই, যে সাহিত্য সমাজের প্রতিষ্ঠিত নৈতিকতার উলটোদিকে দাঁড়িয়ে আছে। না, সে সাহিত্য কোনও সামাজিক আন্দোলনের চেহারা নেয়নি, কিন্তু টেক্সটগুলো পড়তে গিয়ে যে ভাষা ও বাস্তবতার মুখোমুখি হচ্ছি তাকেই আমরা কাউন্টারকালচার সাহিত্য বলছি। যদিও যে সময়কালের সাহিত্য থেকে আমরা বিষয়টিকে চিহ্নিত করবে, তখন 'কাউন্টারকালচার' শব্দটির জন্মই হয়নি। কিন্তু শব্দটি আমরা ব্যবহার করছি, কারণ বিষয়টিকে সংজ্ঞায়িত করতে আমাদের সুবিধে হবে। একদম চুলচেরা ঐতিহাসিক কালক্রম মেনে আমরা টেক্সটগুলোকে চিহ্নিত করছি না, একটা মোটামুটি কালক্রম মেনে চলার চেষ্টা করছি। সাল-তারিখের ভুল হতে পারে, কিন্তু সে ভুলে বিষয়টির তাৎপর্য কিছুমাত্র কমে না।

শুরু করতে চাই চর্যাপদের কবিদের দিয়ে। চর্যাপদের কবিরা ছিলেন সমাজের শ্রমজীবী নিম্নবর্গের মানুষ। পেশায় এঁরা ছিলেন তাঁতি, চামার, কুমোর, ধোপা, দর্জি। লুইপাদ, ভুসুকপাদ ও আরও অনেক চর্যাপদের কবিরা ছিলেন দেহতত্ত্বের সাধক। তাঁরা যে দেহতত্ত্বের চর্চা করতেন সেই যৌনযোগাভ্যাসে সমাজের অনুমোদন ছিল না। এঁদের বৈশিষ্ট্য ছিল ১. এঁরা সামাজিক অনুশাসন ও জাতিবৈষম্যের বিরোধিতা করতেন। ২. ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করতেন না। ৩. নানা ধরনের মাদক ব্যবহারের সংস্কৃতি এঁদের মধ্যে ছিল। ৪. ঈশ্বরের চরণে আত্মনিবেদনের বদলে নারী-পুরুষের দেহ মিলনের মধ্যে দিয়ে দেহমনের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টাই ছিল এই সাধকদের কাম্য। চর্যাপদের কবিরা এমন ভাষায় লিখতেন যে, তার দু'রকম মানে হতে পারে, যে ভাষাকে তাঁরা সান্ধ্যভাষা বলেছেন। যে ভাষা অদীক্ষিত পাঠক একরকম অর্থ বুঝবেন আর দেহতত্ত্বের সাধকরা যার প্রকৃত অর্থ বুঝবেন। এই সান্ধ্যভাষাকে আমরা মনে করি কাউন্টারকালচারের ভাষা আর সেই ভাষার কবিরা হলেন আমাদের চোখে কাউন্টারকালচার কবি। সমাজের যে চালু ভাষা তার বিপরীতে দাঁড়িয়ে সান্ধ্যভাষার এই নির্মাণ—চর্যাপদের কবিদের এ এক ভাষাবিপ্লব। এই সাধকদেরই উত্তরসূরি লালন ফকির। এই নিয়ে আমরা পরে আবার লিখব। বাংলা সংস্কৃতিতে যা কিছু কাউন্টারকালচার সেই সব বিষয় আমরা এই বাংলাব্ল্যাক উদ্যোগের মাধ্যমে ইন্টারনেট আর্কাইভে রাখতে থাকব।

নন্দলাল বসুর কল্পনায় লালন

কেন ইন্টারনেট আর্কাইভ?

আমরা দেখেছি যে যখন শাসন করে সে তার মতো করে ইতিহাস লেখে। সেটা শাসকের ইতিহাস। উলটোদিকের মানুষদের কথা সেই ইতিহাসে লেখা থাকে না। যদি না কোনো গবেষক সেটি খুঁজে বের করেন। ইন্টারনেট আসার পর ইতিহাসের এই একমাত্রিকতা ভেঙে চুরমার। এখন উলটোদিকের মানুষদের লেখা, ভাবনা ইত্যাদিও লিখে রাখা যাচ্ছে ইন্টারনেটে। সেটি আপামর জনগণ যেকোনো সময় ইচ্ছে করলেই পড়তে পারে। আমরা যেহেতু কাউন্টারকালচারে বিশ্বাসী তাই আমাদের ধারণা সমাজে নতুন ধরনের ভাবনাচিন্তার যোগান কাউন্টারকালচারিস্টরাই দিয়ে এসেছে। যার ফলে সমাজও এগিয়েছে। যারা শাসক তারা সমাজকে ম্যানেজ করে একটা কোম্পানি চালানোর মতো আর কাউন্টারকালচারিস্টরা সমাজ গড়ে বা গড়তে চায় তাদের ভাবনায়। তো এই কাউন্টারকালচারের ইতিহাসটা কোথাও লিখে রাখা দরকার, ইন্টারনেট আর্কাইভ হল সঠিক জায়গা এটার জন্য। আমরা বাঙালি, তাই বাংলাতে লিখে রাখার কথা ভেবেছি।

গত ৫ বছরে আমাদের দেশে যা যা ঘটেছে তাতে মনে হচ্ছে গণতন্ত্র ব্যাপারটাই ইউটোপিয়া। একমাত্র জায়গা হচ্ছে ইন্টারনেট যার কোনো মালিকানা নেই। ইন্টারনেটের মালিকানা এখনও কারোর কাছে নেই বলে এই জায়গাটা এখনও ফ্রি স্পেস হয়ে রয়ে গেছে। আর্টিস্ট হিসেবে আমাদের কাজ হল আমাদের দেশে যত রকমের কাউন্টারকালচারের ভাবনা চিন্তা হয়েছে তার একটা ডকুমেন্টেশন করা। কিন্তু সেই জায়গাটা একেবারেই নিয়ে নিয়েছে কনজিউমারিস্ট কালচার ও রাজনীতি। এখন যেকোনো জিনিসের একটা দাম নির্ধারণ করা হয় এবং সেই দামে জিনিসটি বেচে লাভ না হলে সেটার কোনো মূল্যই নেই। আমরা এরকম দাবিও করছি না যে আমরা মার্কেট ফোর্সের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারব। সারা বিশ্ব জুড়ে যে ইন্টারনেট স্বাধীনতার লড়াই চলছে সেই লড়াইয়ে আমরাও একটা ছোটো অংশ নিতে চাই। সেই লড়াইটা হল যে তথ্যগুলো আমাদের কাছে আছে সেগুলো নিঃস্বার্থভাবে পাবলিক ডোমেইনে তুলে দেওয়া। আমরা দেখেছি আম্ মাদের তৈরি 'গান্ডু' ফিল্মটি ইন্টারনেটে পাওয়া যাওয়ায় সারা ভারতের এবং বাংলাদেশেরও অধিকাংশ মানুষ দেখেছে। একটি ফিল্ম সেন্সর, ডিস্ট্রিবিউটর, বিজ্ঞাপন ও মাল্টিপ্লেক্স ছাড়াই হাজার হাজার মানুষের কাছে পৌঁছল শুধু ইন্টারনেটের কল্যাণে। বোঝাই যাচ্ছে আগামীদিনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের হাতিয়ার ইন্টারনেট। মাও সে তুং স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, সাংস্কৃতিক বিপ্লব করতে গেলে প্রথমেই পার্টির সদর দপ্তরে কামান দাগতে হবে। যে সদর দপ্তর বিপ্লবী সংস্কৃতির (যা পার্টি অনুমোদিত নয়) ওপর খবরদারি করে। মাও যে প্রতীকী সাংস্কৃতিক কামানটি দাগবার কথা বলেছিলেন, এখন বলা যায়, উলটো তত্ত্বে সদর দপ্তর কামান দেগে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, প্রতিটি দপ্তরই এখন সদর দপ্তর বা কোনো দপ্তরই আর সদর দপ্তর নয়। ■